মধ্যবিত্তের সংকট ও ধর্মনারায়ণ দাশগুপ্তের ছবি

চিত্রকর ধর্মনারায়ণ দাশগুপ্ত। এক অন্য চোখে নতুনভাবে তাঁকে দেখলেন দেবকুমার সোম। উঠে এল শিল্পীর জীবনের একটি অন্য ছবি।

নিজের ছবি প্রসঙ্গে ধর্মনারায়ণ দাশগুপ্ত আমাদের জানিয়েছেন যে, তাঁর ছবির চরিত্রগুলো অনেক সময় মধ্যাকর্ষণ শক্তির নিয়ম না মেনে শূন্যে ভাসমান, কিংবা ঘরের দরজা-জানলা, মানুষবিহীন পাঞ্জাবি ইত্যাদি বাতাসে ভাসমান। কারণ এইসব ছবির চরিত্রগুলো মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সংকট ব্যক্ত করছে। মধ্যবিত্ত শ্রেণী যেমন শিকড়চ্যুত, বায়বীয় স্বপ্নবিলাসী, তাঁর ছবির চরিত্রগুলোও তেমন। অর্থাৎ তিনি মূলত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সংকটকেই তাঁর ছবিতে তুলে ধরেছেন। আবার শ্রদ্ধেয় মৃণাল ঘোষ আমাদের জানিয়েছেন যে, অলীক স্বপ্ন, হাস্যরস আর বিদ্রুপ এই তিনটে জিনিসের মধ্যে দিয়ে ধর্মনারায়ণ দাশগুপ্ত সমাজের সমালোচকের ভূমিকা নিয়েছিলেন।

এই দুই বক্তব্যকে পাশাপাশি রাখলে আমরা বুঝতে পারি যে, ধর্মনারায়ণ দাশগুপ্তের ছবির বিষয় ড্রয়িংরুমে টাঙিয়ে রাখার মতো চিত্তাকর্ষক নয়। তাঁর ছবিতে সৌন্দর্য আপেক্ষিকভাবে ধরা পড়েছে, যেখানে নৈসর্গিক ভাব অনুপস্থিত। বরং তাঁর ছবিতে আমাদের শ্রেণীগত অবস্থান ধরা পড়ে। ধর্মনারায়ণ ১৯৩৯ সালে ত্রিপুরার ধর্মপুরে জন্মেছিলেন। তাঁর বাবা কাজের সূত্রে ত্রিপুরার অনেক স্থানে থেকেছেন। ধর্মনারায়ণ সে-সব স্থানের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে অনুপ্রাণিত হয়ে শিল্পচর্চায় উৎসাহী হয়ে ওঠেন। আঠেরো বছর বয়সে তিনি ত্রিপুরা ত্যাগ করে শান্তিনিকেতনের কলাভবনে ভর্তি হন। তাঁর জীবনের প্রথম আঠেরোটা বছর অর্থাৎ গত শতাব্দীর চার এবং পাঁচের দশক এই উপমহাদেশের সবচেয়ে ঘটনাবহুল সময়কাল। এর মধ্যে অন্যতম প্রধান ঘটনা ধর্মের ভিত্তিতে ভারত উপমহাদেশের বাঁটোয়ারা। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। স্বাধীনতার স্বপ্নভঙ্গ। উদ্বাস্তু সমাজ আর কালোবাজারি। এই সময়টা, অর্থাৎ দেশ ভাগের পূর্বাপর সময় বাংলার মধ্যবিত্তশ্রেণীর আশাভঙ্গ অনেকের মতোই ধর্মনারায়ণকেও বিক্ষুব্ধ করে থাকবে।

শান্তিনিকেতনে তাঁর ছাত্রবৃত্তি নেওয়াকে তিনি পরবর্তীকালে ব্যাখ্যা করেছেন অর্ধ-শিক্ষিত এক কিশোরের নতুন জীবন পাওয়া। এই বাক্যটি থেকে পরিষ্কার যে ধর্মনারায়ণের কিশোরকালের অভীষ্ট শান্তিনিকেতনের ছাত্রবৃত্তি। কলাভবনের তখনকার শিক্ষক বিনোদবিহারী আর রামকিংকরের স্নেহছায়ায় অন্যান্যদের মতো ধর্মনারায়ণও ঋদ্ধ হয়েছিলেন। কলাভবনে তখন যেন রাজসূয় যজ্ঞ চলছে। পাঁচ-ছয়ের দশকের কলাভবন রবীন্দ্রনাথের শতবর্ষ উদযাপনকে কেন্দ্র করে বহুমুখী কর্মকাণ্ডে ব্যপৃত। সাতান্ন থেকে একষট্টি কম-বেশি চার বছরের কোর্স শেষ করে ধর্মনারায়ণ ফের ফিরে যান ত্রিপুরায়। কিন্তু সেখানে কিছুতেই থিতু হতে পারেন না। ছয়ের দশক সব অর্থে ছিল দুনিয়া জোড়া যুব আস্ফালন, বিস্ফোরণের দশক। সেই বিস্ফোরণের ঢেউ আছড়ে পড়েছে কলকাতা শহরে। কমিউনিস্ট পার্টির ভাঙন, হাংরি জেনারেশন আন্দোলন, সত্যজিৎ-ঋত্বিক-মৃণালের চলৎছবি, সোসাইটি ফর কনটেম্পোরারি আর্টিস্ট। এত সব কর্মকাণ্ডের মধ্যে ধর্মনারায়ণ এসে হাজির হলেন কলকাতায়। তখন এই শহরে তাঁর মতো আরও কিছু নবীন চিত্রকর নিজেদের স্বকীয়তা আবিষ্কারের চেষ্টায় জান কবুল করেছেন। এঁদের অনেকেই পশ্চিমী শিল্পকলায় ঝুঁকছেন। কেউ আবার সম্পূর্ণত দেশজ উপাদানে নিজেদের অস্তিত্ব খুঁজে পাচ্ছেন। শান্তিনিকেতন পর্বে ধর্মনারায়ণ রাজস্থানী ও পাহাড়ি চিত্রকলায় আকৃষ্ট হয়েছিলেন। তার সঙ্গে তান্ত্রিক শিল্পকলা চর্চাও করেছিলেন। কলকাতায় এসে তিনি তাঁর সতীর্থদের মতো পশ্চিম ইউরোপের শিল্পকলায় মনোনিবেশ করেন। বিশেষত এক্সপ্রেশনিস্ট আর সাররিয়ালিসম্ অনুশীলন করেছিলেন।

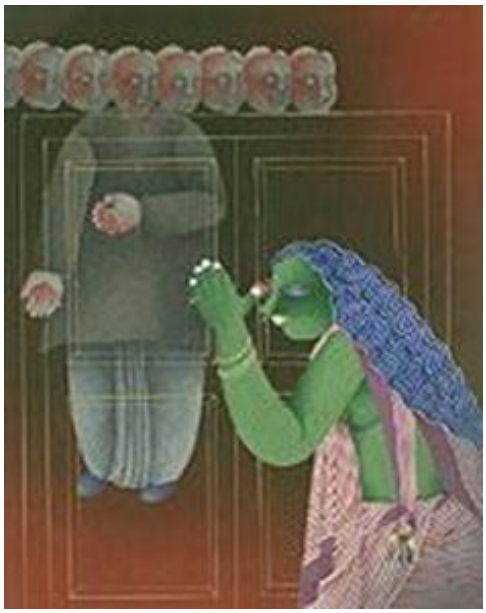

১৯৬৩ সালের নভেম্বর মাসে কলকাতার পার্কস্ট্রীটে তাঁর প্রথম একক চিত্রপ্রদর্শন হয়। সেই প্রদর্শনে তাঁর আটখানা তৈলচিত্র আর বাইশটা জলরঙের কাজ ছিল। সেই প্রদর্শন যে সফল হয়েছিল এমনটা বলা যাবে না। শিল্পী তখনও পশ্চিম ইউরোপের চিত্রকলার মূল রসায়ন আত্মস্থ করে উঠতে পারেননি। তাই আমরা দেখতে পারছি ঠিক তারপরের বছরেই দিল্লিতে তাঁর দুই বন্ধু রামকৃষ্ণান ও দেবীপ্রসাদ সাহার সঙ্গে যৌথ চিত্রপ্রদর্শন করলেন। এখানকার সব কাজের ঝোঁক সাররিয়ালিজম্। এই প্রদর্শনে তাঁর কাজের কিছু প্রশংসা জুটল। তখনও চিত্রকর হিসেবে তাঁর স্বকীয়তা স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি। বরং ১৯৬৬ সালে গণেশ পাইন, লালুপ্রসাদ সাউ, বিকাশ ভট্টাচার্য প্রভৃতির সঙ্গে কলকাতায় যে যৌথ চিত্রপ্রদর্শনে অংশ নিলেন সেখানে তাঁর কিছু বড় কাজে ডিটেলিং সম্পর্কে দ্য স্টেটসম্যান প্রশংসা করে। এভাবেই পুরো ছয়ের দশক

ধরে ধর্মনারায়ণ তাঁর অস্তিত্ব সংকটজনিত কারণে বার বার ফর্ম কিংবা কনটেক্সট পরিবর্তন করেছেন।

এরই ফলশ্রুতি সাতষট্টি সালেই লালুপ্রসাদের সঙ্গে যৌথভাবে আর একটি প্রদর্শনী। এখানে দু-ধরনের ছবি প্রদর্শিত হয়েছিল। পোট্রেইট ছিল। ছবির মুখগুলো ভয়ার্ত, আতঙ্কিত। পুরো ছয়ের দশক জুড়ে পশ্চিমবঙ্গে যে রাজনৈতিক অস্থিরতার সৃষ্টি হয়েছিল, তারই প্রতিফলন ঘটেছিল ছবিতে। দ্বিতীয় ধরণের ছবিতে ফ্যান্টাসি মূখ্য। বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে সমাজকে দেখা, মধ্যবিত্ত মানুষগুলো এই প্রথম তাঁর ছবিতে কার্যকারণ সম্পর্ক নিয়ে এল। নান্দনিক দিক থেকে এই ছবিগুলো অবশ্যই চমক সৃষ্টি করেছিল। যখন তাঁর সতীর্থরা গেরস্ত জীবন উপজীব্য করছেন, তখন ধর্মনারায়ণের সরাসরি সাম্প্রতিকতার দিকে মুখ ফেরানো অবশ্যই বিশেষজ্ঞদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এরপরে ১৯৭০ সালে তাঁর ছবিতে একটি গাড়ি মূল চরিত্র হয়ে উঠল। বোঝা গেল ধর্মনারায়ণ তাঁর পথ খুঁজে পাচ্ছেন। গাড়িটি প্রতীক হিসেবে ছবির বিষয় হওয়ায় ছবিতে সমাজের গতিজাড্যতার ব্যাখ্যাত হয়ে উঠল।

এই পর্বে অর্থাৎ ১৯৬৮-৭২ পর্বে পশ্চিমবঙ্গ উত্তাল ছিল নকশালবাড়িকেন্দ্রিক জঙ্গি আন্দোলনে। সেই আন্দোলনের অভিঘাত এসে পড়ে বুর্জোয়া সমাজে। মধ্যবিত্ত চিন্তা-চেতনা সেদিন অনেকাংশে ভেঙে গুঁড়িয়ে যায় বিবিধ শ্লোগানে। আর পাঁচজন শিল্পীর মতো এই ঘটনায় ধর্মনারায়ণও বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন। তিনি সেই পর্বে কিছু রাজনৈতিক ছবি আঁকেন। শূন্যে পাঞ্জাবি ঝুলছে। রক্তভেজা পাঞ্জাবির গায়ে বুলেটের চিহ্ন। তরুণ প্রজন্মের রক্তক্ষরণে তিনি বিচলিত হয়েছিলেন। ব্যথিত হয়েছিলেন। বিক্ষুব্ধও। ১৯৬০ সালে সনৎ কর, নিখিল বিশ্বাসদের নেতৃত্বে সোসাইটি অফ কনটেম্পরারি আর্টিস্ট গড়ে ওঠে। পরবর্তী সময় গণেশ পাইন, বিকাশ ভট্টাচার্য, লালুপ্রসাদ সাউয়ের মতো ধর্মনারায়ণ দাশগুপ্তও এর অন্যতম কার্যকরী সদস্য হয়ে ওঠেন। এরই ফলশ্রুতি ১৯৮০ সালের যৌথ প্রদর্শনে সম্পূর্ণ নতুন, স্বকীয়তায় উজ্জ্বল ধর্মনারায়ণকে পাওয়া গেল। বিকাশের সাররিয়ালিসম্ আর ধর্মনারায়ণের সাররিয়ালিসম্ সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রেক্ষিতে ধরা দিল। ইমপ্রেশনিস্ট আর্টিস্ট পল গঁগ্যার মতো মধ্যবিত্ত শ্রেণী হয়ে উঠল ধর্মনারায়ণের প্রধান বিষয়। গঁগ্যা বুর্জোয়া শ্রেণীকে যেমন উপহাস করেছেন, ব্যঙ্গ করেছেন, ধর্মনারায়ণ তেমনটা তো করেছিলেনই, তার সঙ্গে যোগ হয়েছে

মধ্যবিত্তের শ্রেণীগত দোদুল্যমানতা। অস্তিত্বের সংকট। তবে, তাঁর চিত্রে বাবু সমাজের প্রতিচ্ছবিই দেখা যায়। তথাকথিত ভদ্দরলোক শাসিত সমাজকেই তিনি তুলে ধরেছেন, যে সমাজ বহুলাংশেই মৃত এবং অবসৃত। আর এর ফলে ধর্মনারায়ণ সেই বিরল শিল্পী তালিকায় নাম লেখালেন যারা ল্যাণ্ডস্কেপ না এঁকে, ন্যুড স্টাডি কিংবা লাইফ মডেল অনুসারী না হয়ে, ছবিতে গল্প কিংবা কাহিনী নির্মাণে পারদর্শী। ফলে ধর্মনারায়ণের ছবির মানুষগুলো লাইফ স্টাডি থেকে না উঠে মোটিফ নির্ভর হল। তারা বাস্তবচিত না হয়ে চরিত্রগতভাবে ক্যানভাসে জায়গা পেল। এইখানে তিনি অনন্য। তিনি তাঁর সমসাময়িক সহযাত্রীদের থেকে অন্যরকম। আর শুধুমাত্র ছবির কেন্দ্রীয় বিষয়ই নয়, ছবিকে বিশিষ্টতা দেওয়ার জন্য বেছে নিলেন এগ টেম্পারা পদ্ধতি। মোটা কাপড় ক্যানভাসের মতো ফ্রেমে বেঁধে তার ওপর ডিমের সাদা অংশ, জিঙ্ক অক্সাইড মিশিয়ে প্রাইমার হিসেবে ব্যবহার করে তারপরে ছবি আঁকা। ছবিতে গভীরতা আনতে মাউথ-স্প্রে পদ্ধতি ব্যবহার ধর্মনারায়ণের বৈশিষ্ট্য। আর এইভাবে স্বকীয়তা খুঁজতে গিয়ে বহু সম্ভাবনাকে পাশ কাটিয়ে জীবনের অনেকটা বছর তাঁকে দিতে হয়েছে নিজস্বতা আবিষ্কারে। ফলে তাঁর সমসাময়িক শিল্পীদের থেকে অনেক পরে ধর্মনারায়ণ সমালোচকদের আদৃত হলেন। দুর্ভাগ্য এই, ঠিক যে সময় তিনি তাঁর শিল্পকর্মের সমাদর পেতে শুরু করেছেন, ঠিক সেই সময় তাঁর জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটে, যা বাংলা সমসাময়িক চিত্রশিল্পের ক্ষতি। যে ক্ষতি আজও আমরা বহন করে চলেছি।

চিত্র পরিচিতি : ১। হিরো : ধর্মনারায়ণ দাশগুপ্ত : অ্যাক্রিলিক অন ক্যানভাস; ২। ধর্মনারায়ণের আঁকা শিরোনামহীন একটি ছবি : টেম্পেরা অন ক্যানভাস; ৩। ধর্মনারায়ণের আঁকা শিরোনামহীন আর একটি ছবি।